প্রথম আলো
AUG. 08 2006

বুয়েট : উপসর্গ নয়, রোগের কারণ দূর করতে হলে...

অরণ্যে রোদন
আনিসুল হক

বাংলাদেশের যে সাংবাদিকেরা গিয়েছিলেন জার্মানিতে, বিশ্বকাপের খবর সংগ্রহ করতে, তারা এবার পরিচয়ের সংকটে ভোগেননি। কোন দেশ থেকে এসেছ? বাংলাদেশ। এটা যেন কোথায়? ইউরোপীয়দের প্রতিক্রিয়া এ রকম হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। হয়েছে উল্টোটা। ও বাংলাদেশ। তোমরা তো খুবই ফুটবল-পাগল (ফুটবল-ক্রেজি)। তোমাদের খবর কাগজে ছাপা হয়েছে। তোমাদের একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বকাপের খেলা দেখার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্টা বুঝলি রাম। আমরা কি আসলেই ফুটবল-ভক্ত জাতি! আমাদের একটা দল ফুটবল খেলতে বাইরে যাচ্ছে, তাদের নামধাম কি আমরা জানি!

কিংবা যে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বকাপ দেখতে আসা নানা মহাদেশের বিচিত্র মানুষদের কাছে বাংলাদেশের নামকে পরিচিত করিয়েছে, আমাদের সাংবাদিকদের জাতীয় পরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা কি আসলেই ফুটবলের দারুণ ভক্ত!

প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি বলতে পারি, ফুটবলের প্রতি সীমাহীন আসক্তি নয়, প্রবল পরীক্ষাভীতিই এ ঘটনার আসল কারণ।

পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন বুয়েটে আজকে প্রথম নয়।

আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ঢাকায় এসেছি শিশু একাডেমীর কোনো একটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। বুয়েটে বড় ভাই পড়তেন। তিনি অডিটরিয়ামে ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়ে গেলেন বৈতালিকের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' দেখাতে। অভিষেক অনুষ্ঠানের গোটাটা জুড়ে ছাত্রেরা চিৎকার করে স্লোগান দিতে লাগল : বিশ তারিখ বিশ তারিখ। কারও বক্তৃতা শোনার উপায় নাই। শুধুই 'বিশ তারিখ বিশ তারিখ' আওয়াজ। ব্যাপার কী? ছেলেরা পরীক্ষা পিছিয়ে ২০ তারিখে নিতে চায়।

এরপর বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পরেও দেখেছি, পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন বুয়েটে সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্দোলন ।

আর বুয়েটের ছাত্রেরা শিক্ষকদের সঙ্গে বৈরী আচরণ প্রদর্শন করেছে, এটাও নতুন নয়। আমরা ভর্তি হওয়ার আগে—আশির দশকের শুরুতে—শহীদ স্মৃতি হলের ছেলেরা হলে ভিসিআর দেখা নিয়ে গণ্ডগোলের এক পর্যায়ে দোতলা-তিনতলা থেকে ফুল ছুড়ে মেরেছিল শিক্ষকদের উদ্দেশে; একদম শরীর লক্ষ্য করে না হলেও তাদের আশপাশে; এবং বলা দরকার, ফুলের সঙ্গে টবসমেত।

আর ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের আগেও ছাত্রেরা ঠিক আজকের কায়দাতেই ভাঙচুর করে বুয়েট বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তখন আমি কাজ করি *ভোরের কাগজ*-এ। সম্পাদকের নির্দেশে বুয়েটে গিয়েছিলাম পরিস্থিতি বুঝতে। দেখা করেছিলাম জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের সঙ্গে। সেই বিবরণ এর আগে আমি তিনবার লিখেছি। এবার চতুর্থবার লিখতে হচ্ছে, কারণ, একই ঘটনা বুয়েটে বারবার ঘটছে।

জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি শাহাদুজ্জামানের লেখা ওই গল্পটা পড়েছ?

ভাগ্যিস পড়া ছিল। এখানে প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশে সেই গল্প থেকে প্রথম ও শেষ দিকের খানিকটা করে উদ্ধৃত করি :

"আমরা তখন বেশ ফুর্তিতেই ছিলাম। ঠিক করেছিলাম আগামী এক মাস আর কোনো কাজ করবো না। শুধু টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল দেখবো। 'বস'কে বলে দিয়েছিলাম 'বস, এই একমাস কোনো কাজ দেবেন না।' কে চ্যাম্পিয়ন হবে এই নিয়ে বাজিও ধরে ফেলেছিলাম।...

"কিন্তু ঝামেলা বাধালো ইঁদুরের মতো ছোটখাটো বুড়ো প্রিন্সিপালটা। এই সময় সে টেস্ট পরীক্ষার ডেট ঘোষণা করলো। এই পরীক্ষা না দিলে নাকি ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দেবে না। পরীক্ষা শুরু হবে ঠিক উদ্বোধনী খেলার আগের দিন। মাথা খারাপ নাকি? এখন একটা পরীক্ষা দেয়ার সময়? প্রিন্সিপালকে বললাম, 'পরীক্ষা পেছাতে হবে।' সে বলে, 'কেন?' আমরা বললাম, 'ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল দেখবো।' সে তখন বলে, 'খেলার চেয়ে পরীক্ষা ইম্পর্ট্যান্ট।' মনে মনে ভাবলাম কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা তুমি বলার কে? আমরা আরও কয়েকবার রিকোয়েস্ট করাতে সে আমাদের তার রুম থেকে বের করে দিল।...

"আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, এবার আমরা কলেজ ক্যাম্পাসে দিনের আলোয়, সবার সামনে একজনকে খুন করবো। তাতে ব্যাটা প্রিন্সিপালকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিতেই হবে। তখন নিশ্চিন্তে খেলাগুলো দেখা যাবে। কিন্তু কাকে মারা যায়?...

"ছেলেটা রোজ সকালে ক্যান্টিনে চা খেতে বসে। ছাত্রছাত্রী আর টিচারদের ভিড়। সুযোগ বুঝে আমরা ক্যান্টিন ঘিরে ফেললাম। আমাদের একজন তারপর ঢুকে গেল ক্যান্টিনের ভেতরে। কিন্তু ক্যান্টিনে ঢুকতেই একটা হৈচৈ, হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই উল্টোপাল্টা দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। ভিড়ের মধ্যে 'লম্বু'কে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়লো। শেষে কি আর করা, বাধ্য হয়ে এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ার করতে হলো আমাদের। অবশ্য টার্গেট মিস হলো না। 'লম্বু' মারা গেলো ঠিকই, সাথে আমাদের টার্গেটের বাইরে অচেনা আরো দুটো ছেলেও মারা গেলো।

"এবার বাবা প্রিন্সিপাল, তুমি সামলাও। আমরা আরাম করে একটু খেলা দেখি। (কারা যেন বলছে)"

বুয়েটের ছেলেরা অত খারাপ নয়। তবে পরীক্ষা পেছানোর জন্য তারা অনেক কিছুই করতে রাজি আছে। ৫ আগস্ট *প্রথম আলোয়* একজন শিক্ষক আর কজন ছাত্রের দুটো লেখা পাশাপাশি ছাপা হয়েছে বুয়েটের পরিস্থিতি নিয়ে। দুটো লেখা পড়ে আমি যা বুঝেছি, প্রথমে বুয়েট কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই পরীক্ষা শেষ করে ফেলতে। তখন ছাত্রেরা পরীক্ষা পেছানোর অনুরোধ করে, আর বলে, তাতে বিশ্বকাপের শুরুর দিকে একটা সপ্তাহ পরীক্ষা চললেও তারা তা মেনে নেবে। সেই মিষ্টি কথায় ভুলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়। তখন ছাত্রেরা আন্দোলনে নামে, বিশ্বকাপের পরে পরীক্ষা নিতে হবে। তাও কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়। এর মধ্যে কর্তৃপক্ষের একটা ইচ্ছার কথা ছাত্রেরা জেনে যায়। সেটা হলো, পরীক্ষা শেষ হলেও নতুন সেমিস্টার শুরু করতে দেরি হবে। প্রথম বর্ষে নতুন একটা ব্যাচকে নিয়ে তারপর শুরু করা হবে ক্লাস। ছাত্রেরা তখন বলে, দেরি যখন হবেই, তখন আরও এক সপ্তাহ পরীক্ষা পেছাও। না হলে ঘোষণা দেওয়া হোক, সেমিস্টার শুরুতে দেরি হবে না। কর্তৃপক্ষ এবার আর পরীক্ষা পেছাতে চায়নি। ব্যস, ছাত্রেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা এমনকি হামলা চালায় শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়ও। পুলিশও তাদের স্বভাবসুলভ একশনে নেমে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়।

বুয়েটে মুখোমুখি শিক্ষার্থী ও পুলিশ

১৯৯৮ সালে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারই আমাকে আরেকটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি কি *রাশোমন* দেখেছ। আকিরা কুরোসোয়ার এই ছবিটাও—ভাগ্য ভালো আমার দেখা ছিল। ছবিতে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী যখন একটা খুন ও ধর্ষণের ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগল, তখন দেখা গেল, একেকজনের বর্ণনা একেক রকম হয়ে যাচ্ছে।

জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারই বলেছিলেন, বুয়েটের এই ঘটনা একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করবে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে [illegible] সমস্যা আছে।

আজ আট বছর পরে প্রায় একই ঘটনা ঘটল। *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত একজন শিক্ষকের বর্ণনা যদি সত্য হয়, সেটা উদ্বেগের কারণ। তিনি লিখেছেন : ছাত্রেরা শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় হামলা করেছে, গার্ডকে মারধর করেছে, শিক্ষকদের গালিগালাজ করেছে এবং ঢিল ছুড়ে দোতালা থেকে পাঁচতলার জানালার কাচ ভেঙে ফেলেছে। ছাত্রদের ঢিলের আঘাতে একজন শিক্ষকের স্ত্রী গুরুতর আহতও

ইন্টারভিউ দেখলাম টিভিতে। তিনি বলছেন, আগে দায়ী ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া হবে, তার আগে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে না।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আট বছর পরে বলতে হচ্ছে, বুয়েটে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে গুরুতর সমস্যা আছে।

শাস্তি এর আগেও বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনার পরে বুয়েটের ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে। সেই সব শাস্তি দৃষ্টান্তমূলকও ছিল। কিন্তু তাতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাচ্ছে না।

ঘটনা কেন ঘটছে, তার কারণ বুয়েট কর্তৃপক্ষ কি গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন?

বুয়েটে দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এই মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কেন পরীক্ষাভীতিতে ভুগতে থাকে? কেন কিছুদিনের মধ্যেই তারা শিক্ষকদের অপছন্দ করতে শুরু করে? কেন একটা কিছু ঘটলেই ছাত্র ও শিক্ষকেরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে কার দোষ, সেটা খুঁজতে শুরু করেন। কেন ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের বন্ধু ভাবতে পারে না?

এই ছাত্রেরাই তো আবার বিদেশে গিয়ে ভালো করে। সব নিয়মকানুনও মেনে নেয়।

আসলে বুয়েটের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই নিশ্চয় কোনো গুরুতর সমস্যা রয়েছে। না-হলে কেন দেশের সবচেয়ে মেধাবী তরুণেরা এসে এখানে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে বসে?

আট বছর আগেও একই কথা লিখেছিলাম। বুয়েটের সামগ্রিক সংস্কৃতিটাই একটা মুক্তমনের মানুষ হওয়ার জন্য প্রতিকূল কি না, এটা ভেবে দেখতে হবে।

শুধু কি শিক্ষকদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ! আমাদের সময়ে (১৯৮৫—৮৯) সমাপনী উৎসব উপলক্ষে একটা স্মরণিকা প্রকাশ করত ছাত্রেরা। সেই স্মরণিকায় একটা জরিপের ফল ছাপা হতো। সরকারি চাকরি পেলে ঘুষ খাবে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯০ জনই বলত, তারা ঘুষ খাবে।

এবং তখন এই উত্তরটা দেখে আশ্চর্য হইনি। কিন্তু এই প্রশ্ন কি সঙ্গত নয় যে এই জাতি তার শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের বুয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে মাসুম হিসেবে তুলে দেয়। ওই প্রতিষ্ঠানে চার বছর শিক্ষকেরা কী শেখান যে তারা এ ধরনের দুর্নীতিকে আদর্শ পন্থা হিসেবে ভাবতে শেখে?

অথচ সেই ছেলেমেয়েরাই বুয়েটের বাইরে গিয়ে অপূর্ব সব ভালো কাজের উদাহরণ সৃষ্টি করে। সারা পৃথিবীতে বুয়েটের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে। দেশের জন্য তারা কত কী করতে চায়, আমার সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে, তাদের দেখেই আমি সেটা বুঝি।

আসলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ে কখনো ভাবে বলে মনে হয় না। আমি শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। তাদের বেশিরভাগই বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশপ্রেমের কারণেই ফিরে এসেছেন দেশে। কারিগরি বিষয়ে তারা যেসব পরিকল্পনায় অংশ নেন, তদারক করেন, সেসবের মান নিয়েও আমরা নিঃসংশয় থাকতে পারি। কিন্তু মানুষ তো ইট-কাঠ-পাথর নয়। মানুষের সঙ্গে কীভাবে চলতে হয়, কথা বলতে হয়, কীভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়, সেটা বোধ হয় বুয়েট কর্তৃপক্ষ কমই জানে।

আর বুয়েটের প্রগতিশীল সুসংস্কৃত শিক্ষকেরা, যারা ওই অচলায়তনের দরজা-জানালা খুলে দিতে পারতেন, তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন বলে আমার ধারণা। অনেকেই প্রগতিবিরোধী হাওয়ায় শ্বাস নিতে না পেরে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে চলে গেছেন।

এর আগেও আমি আমার লেখায় প্রশ্ন করেছি, বছরের পর বছর জাতি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাঠিয়েছে বুয়েটে, তারা কোথায় গেল? এই দেশের পরিকল্পনা, উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান কই?

এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? কেউই দায়িত্ব নেবে না। আর বুয়েট কর্তৃপক্ষ? তারা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তদন্ত কমিটি গঠন করে নিয়মভঙ্গকারী ছাত্রদের শাস্তি দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ বলে মনে করে আসছে। এবারেও তাই হবে।

আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। আমি সমস্যার সমাধানে করণীয় কী বাতলে দিতে পারব না। আমি শুধু সমস্যার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। আর বলতে পারি, পড়া আর পরীক্ষাটাকে আনন্দপূর্ণ করতে হবে। আর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে এই মেধাবী ছেলেমেয়েগুলোর মনের ভেতরটাকেও শুশ্রূষা করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের অচলায়তন হয়ে উঠছে বুয়েট, ওই অচলায়তন ভাঙতে হবে।

শুধু উপসর্গের চিকিৎসা দিয়ে এই রোগ সারবে না, রোগের কারণ নির্ণয় করে সেটাকে উৎপাটিত করতে হবে।